সরমা

মেঘনাদবধ কাব্যের নারী-চরিত্রগুলির মধ্যে প্রমীলা, সীতা, চিত্রাঙ্গদা ও মন্দোদরী যেভাবে সমালোচকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে "সরমা"-চরিত্রটি সাধারণতঃ সেভাবে আকর্ষণ করে না। অথচ তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয়টুকুর মধ্যে আমরা তাহার যতখানি জানিতে পারি, তাহাতে নারীত্বের যে শতদল শোভা বিকশিত হইতে দেখা যায়, তাহা কখনও উপেক্ষার বস্তু হইতে পারে না। এই স্নিগ্ধ-মধুর নারী-চরিত্রটি বুঝিতে হইলে আমাদের একবার ভাবিতে হয়, সামান্য একটু বিশ্রম্ভালাপের ক্ষীণ পরিসরের মধ্যে কীভাবে সে তাহার মনপ্রাণ ঢালিয়া দিয়াছে, কিভাবে তাহার নীতিবোধ, ধর্মবোধ, এক কথায়, তাহার চরিত্রের সমুন্নতি, একেবারে অনাবৃত করিয়া ধরা দিয়াছে। অপর নারী-চরিত্রগুলির ন্যায় সমগ্র কাব্যের উপর ইহার প্রভাব তেমন প্রত্যক্ষ ও স্থায়ী না হইতে পারে ; কিন্তু এই নিঃশব্দসঞ্চারী আভিজাত্যবর্জিত চরিত্রটি মুহূর্তের জন্য আমাদের মনকে যেভাবে শ্রদ্ধানত করিয়া ফেলে তাহার যথাযথ মূল্য না দিতে পারিলে ইহাকে অকারণ উপেক্ষাই করা হয়।

নারী-স্বভাব-সুলভ কোমলতা ও সমবেদনার বশবর্তী সরমা সীতার লাঞ্ছনায় প্রতিনিয়ত মনঃ-পীড়ায় কাল কাটাইয়াছে। তাহার এই মানসিক যন্ত্রণা আরও বাড়িয়াছে নিজের অসহায়তার জন্য। ধর্মপ্রাণ স্বামী ধর্মের মর্যাদা রক্ষার জন্য শত্রুপক্ষে যোগদান করায় পুরীমধ্যে সে সকলেরই চক্ষুশূল।

ইচ্ছা থাকিলেও কোন কাজ তাহার স্বাধীনভাবে করিবার উপায় নাই। নারীকুলচন্দ্রমা সীতাদেবীর উপর অযথা অত্যাচার চলিতেছে, নারী হইয়া সে কেমন করিয়া সহ্য করিবে? কিন্তু উপায় নাই, সে সর্বপ্রকারে দুর্বল; মুখের সান্ত্বনা দিয়াও যে আতঙ্ক-কণ্টকিতা বৈদেহীর কষ্টের লাঘব করিবে তাহার উপায় নাই—চারিদিকেই চর ও চেড়ীর সতর্ক পাহারা। তাই সকলের অজ্ঞাতে অবিরল অশ্রুবর্ষণ করা ছাড়া সরমার আর কোন পথ নাই। এইজন্য মেঘনাদের অভিষেক-উৎসবে সকলকে মত্ত থাকিতে দেখিয়া এই সহৃদয় রক্ষোললনা যে অবসর খুঁজিয়া পাইল তাহাতেই ছুটিয়া আসিল অশোকবনের আঁধার কুটীরে। সীতার চরণতলে বসিয়া কোন বাক্যালাপের পূর্বেই সরমা কাঁদিতে লাগিল, তাহাতে বুঝিতে হয়, এ কান্না তাহার এই মুহূর্তের নয়, অহোরাত্র যে কান্না সে এতদিন চাপিয়া রাখিয়াছিল, ইহা তাহারই উচ্ছ্বসিত মুক্তধারা। যদি সরমার আর কোন প্রসঙ্গই না থাকিত তথাপি এই উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের মধ্যে আমরা তাহার নারী-হৃদয়ের যে পরিচয় পাইতাম তাহা কি উপেক্ষার যোগ্য? এই কান্না কেবল এক নারীর দুঃখে অপর এক নারীর সমবেদনা নহে,—ইহারই মধ্যে আছে সরমার ধর্মবোধ, নীতিবোধ, অসহায়তার কাতর নিবেদন, অকর্তব্যজনিত ক্ষমা প্রার্থনা, প্রবল আত্মধিক্কার ও দেব-আকাঙ্ক্ষিত সীতাদেবীর চরণ-স্পর্শের অবসরলাভজনিত পুলকোচ্ছ্বাস।

সরমা-চরিত্রের অন্যতম আকর্ষণ হইল, তাহার মধ্যে আমরা আদর্শ বঙ্গনারীর এক অতি মধুর চিত্র দেখিতে পাই। কোন সমালোচক বলিয়াছেন, মধুসূদনের চক্ষে "যেন নারীমাত্রেই বঙ্গনারী—" সরমাও সীতাকে সিন্দূর পরাইবার আগে যাহা বলিতেছে, তাহা ভারতের আর কোন দেশের সধবা আর এক সধবাকে নিশ্চয় বলে না—

'আনিয়াছি কৌটায় ভরিয়া সিন্দূর,
করিলে আজ্ঞা, সুন্দর ললাটে দিব ফোঁটা।
এয়ো তুমি, তোমার কি সাজে এ বেশ?'

'এয়ো তুমি' রাক্ষসবধূ সরমার কথাই বটে।

এখানে এই সরমা-সতীর মুখের কথা, এই কৌটা খুলিয়া যত্নের সহিত সীতার সীমন্তে ফোঁটা দেওয়ার পর পদধূলি গ্রহণ, ইহাতে আমরা তাহাকে পাই একেবারে খাঁটি বঙ্গবধূরূপে। বঙ্গনারীত্বের এই মধুর রূপের আদর্শে সীতা অথবা প্রমীলাও যেমন, সরমাও তেমনি চরিত্রের মাধুর্যে ও মহিমায় বিশ্ববাসীর শ্রদ্ধা অর্জন করিতে সক্ষম; মধুসূদন মাতৃভাষায় কাব্য লিখিতে বসিয়া যেন নিজের মাতৃজাতিরও বন্দনা গাহিয়াছেন।

সতীই বুঝে সতীর মহিমা, সতীই রাখে সতীর মান। তাই সীতার কপালে এয়োতির চিহ্ন অনুজ্জ্বল দেখিয়া সরমার প্রাণ তো কাঁদিয়া উঠিবেই। সে কত আশা করিয়া আজ সীতাদেবীর কপালে ফোঁটা দিবে বলিয়া কৌটা ভর্তি করিয়া সিন্দূর আনিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে এই দুই মহীয়সী মহিলার মিলন-মুহূর্তে সীতা অপেক্ষা সরমাই আমাদের চোখে বড় হইয়া উঠে, তাই বুঝি কবি তাঁহার উপমায় অতি সতর্ক ভাষায় জানাইয়াছেন:

'আহা মরি, সুবর্ণ-দেউটী
তুলসীর মূলে যেন জ্বলিল, উজলি
দশ দিশ!'

এখানে তুলসীর সহিত উপমিত হওয়ায় সীতার পবিত্রতা ও দেবত্ব যেভাবে প্রকাশিত হইয়াছে তদপেক্ষা তাহার আরতির ব্যবস্থা অধিকতর হৃদয়গ্রাহী। সরমাকে সুবর্ণ-প্রদীপের সহিত তুলিত করিয়া কবি কেবল যে তাহার রূপেরই প্রশংসা করিয়াছেন তাহা নহে, সুবর্ণ-প্রদীপে যেমন পাত্রের প্রশস্ততা বুঝায় এখানেও তেমনি পূজারিণী হিসাবে সরমার অন্তরের প্রশস্ততা বুঝিতে হয়। ইহা ছাড়া দশ দিক্ আলো করিবার যে ভার তাহাকে দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে বুঝি, তাহার পূত চরিত্রের কমনীয় জ্যোতির কথা আমাদের মনে জাগাইয়া দেওয়াই কবির উদ্দেশ্য।

সরমার মূল্য আর কেহ না হউক, সীতা তো বুঝিয়াছিলেন। তাই তাঁহারই মুখে শুনিতে হয় সরমার মূল্য,—সে ছিল, মরুভূমির মধ্যে প্রবাহিণী, রৌদ্রের মধ্যে ছায়া, নির্দয়তার মধ্যে মূর্তিমতী দয়া, পঙ্কিল জলে পদ্ম, ভুজঙ্গিনীরূপী কনকলঙ্কার সেই হইল শিরোমণি।

এই চরিত্রের উপযোগিতার কথা বলিতে গেলে প্রথমেই দেখিতে হয়, চতুর্থ সর্গটির প্রয়োজন সিদ্ধির মূলে যে দুইটি মাত্র চরিত্র-যোজনার আয়োজন করা হইয়াছে, ইহা তাহারই একটি। এই দুইটিকেই অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে যে শাখা-কাহিনী তাহা মহাকাব্যের বৈচিত্র্যবিধানের জন্য অপরিহার্য অথচ সরমাকে বাদ দিয়া এই বৈচিত্র্যের পরিকল্পনাই অচল। দ্বিতীয়তঃ, সরমাই ফুটাইয়াছে সীতার চরিত্র ও মাহাত্ম্য; এই দরদী সখীর কোমল স্পর্শ না পাইলে সীতার মুখ দিয়া কোন কথাই বাহির হইত না। সরমা সমবেদনাকাতর চিত্তে যখন তৃষাতুরের ন্যায় সীতার পূর্বজীবন-কাহিনী শুনিতে চাহিল তখন সীতাও যেন আপন বক্ষ উজাড় করিয়া পুঞ্জীভূত ব্যথার কিঞ্চিৎ অপনোদন না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। সীতার পক্ষে বুঝি একমাত্র সরমারই গলা ধরিয়া কাঁদা সম্ভব ছিল, তাই পাওয়া গিয়াছে গোমুখীর মুখ-নিঃসৃত পূত বারিধারার ন্যায় জানকীর মধুর ভাষণ, তাঁহার হালিকান্নায়-ভরা আরণ্যজীবনের পবিত্র কাহিনী।

বস্তুতঃ, মেঘনাদবধ মহাকাব্যের এই শান্ত অবসরটুকুর জন্য কবি ও পাঠক সকলেই সরমার নিকট ঋণী। যুদ্ধবিগ্রহ, শোকতাপ, দেব-মানবের আনাগোনা—সমস্ত মিলিয়া যে একটি কল্লোল এই মহাকাব্যে বহিয়া চলিয়াছে, তাহার মধ্যে এই চতুর্থ সর্গটি এক শান্ত আবহাওয়ার কূল রচনা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দুইটি মহিয়সী রমণী-হৃদয়ের পবিত্র সুষমা দিয়া রচিত এই কূলটি করুণরসের এক মধুর ধারায় সিঞ্চিত, সঞ্জীবিত ও শীতলায়িত। কিন্তু এই মধুর ধারার উৎস কোন একটি হৃদয় নহে, সীতা-সরমার যুগ্ম-হৃদয়। সুতরাং এই কাব্যে সরমাকে বাদ দিয়া সীতার কোন অস্তিত্ব নাই। আর এই সরমার অভাবে লুপ্ত হয় মেঘনাদবধ-কাব্যের অন্যতম প্রধান ঐশ্বর্য—ইহার শিবিক-সংস্কার।